



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 321 - 330

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

আলো-আঁধারের অনুষ্ণ ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা

তন্ময় সরদার

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

দেওয়ান আব্দুল গণি কলেজ, হরিরামপুর

Email ID: tanmaysardar2014@gmail.com



Received Date 15. 06. 2026

Selection Date 15. 07. 2026

Keyword

Alo - Adhar,
Loneliness,
Context, Beauty,
Introspection,
Exhaustion,
Imprisoned.

Abstract

While the primary aim of poetry is to evoke an appreciation of beauty, it also instills inspiration, courage, and wisdom in the reader. Through his poems, one observes how the poet—amidst the multifaceted interplay of Alo - Adhar—refused to remain submerged in darkness; instead, he overcame the despair of a weary mind and moved towards the light. This journey undoubtedly offers inspiration, courage, and valuable lessons. It is worth noting that this discussion focuses primarily on the poetry collections ranging from 'Nilnirjan' to 'Nakshatra Joyer Jonyo', although the multifaceted nature of the light-shadow dynamic persists in his later works as well. Across various mythologies, folktales, and religious beliefs—both domestic and international—light emanating from the sun is revered as the source of life itself. Within Indian tradition, this light is regarded not merely as the origin of life but as a symbol of auspiciousness, power, and the Divine. Conversely, in Indian philosophy, darkness symbolizes sorrow, melancholy, and malevolent forces; poets have employed light with this very significance since ancient times. The imagery of light and shadow features prominently in the works of Rabindranath Tagore as well as in the writings of post-Tagore poets. An analysis of these motifs in Nirendranath Chakraborty's poetry reveals how he was wearied by the darkness of subjugation, loneliness, despair, gloom, and exhaustion—feelings stirred by the social upheavals of the pre- and post-independence eras. Yet, darkness also served as a catalyst for the poet's introspection; within this darkness, he sought to delve into his inner self and discover his true essence, ultimately finding a vibrant, living light amidst the gloom. Refusing to remain imprisoned by the encroachment of darkness, he embarked on a journey toward the light. This essay attempts to explore these underlying contexts regarding the use of light and shadow in his poetry.

Discussion

কবিতার কারণ অনুসন্ধানে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শেলি ও রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হয়ে যে দুটো বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন তার একটি কবিতা বস্তুজগতের গোপন সৌন্দর্যের নির্মোহটাকে মুক্ত করে দেয়, অন্যটি হল কবিতা

কবিচিন্তে গভীর অনুভূতি ও ভাষায় সুন্দর রূপ নিয়ে আপন নিত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। কবির মতে এই দুটি মত আসলে একে অপরের পরিপূরক। কারণ একজন বলেছেন কবিতার উপকরণ বা বিষয়বস্তু নিয়ে অন্যজন বলেছেন কবিতার উপলব্ধিকে নিয়ে। এই মতগুলোর পাশাপাশি কবি নিজমত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন, কবিতা আমাদের সাহস, প্রেরণা, সান্ত্বনা ও শিক্ষা প্রদান করে এবং কবিতা পাঠের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হলো সৌন্দর্যদর্শন। এই সাহস, প্রেরণা, সান্ত্বনা কবিতা কীভাবে প্রদান করে সেটা বোঝাতে গিয়ে কবি নীরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের ‘দুঃসময়’ কবিতায় সঙ্গীহীন পাখির প্রতিকূল পরিবেশেও নিজ ভূমিকায় সুস্থিত থাকার ও ‘মৃত্যুর পরে’ কবিতায় শোকাক্ত সময়ে আমাদের সান্ত্বনা প্রাপ্তির কথা বলেছেন। দৃশ্যমান বস্তুজগতের যেকোনো অতিপরিচিত বস্তু বা বিষয় কবির অনুভূতির আলোয় পাঠকের কাছে অপরিচিত হয়ে অভিঘাতের তরঙ্গ তোলে এবং এই অভিঘাত তৈরি হয় সাহস, প্রেরণা, সান্ত্বনা ও শিক্ষাকেন্দ্র করে তবে কবিতা তখনই হয়ে ওঠে যখন তা সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে এবং কবির অনুভূতিকে সার্বজনীন ও নিত্যকালের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়। কবি ‘কবিতা কেন’ প্রবন্ধে বলেছেন, -

“সত্যি বলতে কী, সেই অভিঘাত যদি সাহস, প্রেরণা, শিক্ষা কিংবা সান্ত্বনাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়ে না উঠত, তাতেও কোন ক্ষতি ছিল না। কেননা, কবিতার কাছে আমাদের প্রাপ্তি শুধু এইটুকুই নয়, আরও বেশি। সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি সৌন্দর্যদর্শন। যার অভিঘাত আরও ব্যাপ্ত হয়ে, বস্তুত আমাদের সমগ্র চিত্ত জুড়ে কাজ করতে থাকে।”

সমালোচক নীরেন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কবি নীরেন্দ্রনাথের কবিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখবো যে সামাজিক নানা পরিবর্তন, মূল্যবোধের বিপর্যয়, রাজনৈতিক টানাপোড়ন, ও ব্যক্তি মানুষের নানা সংকট তাঁর উপলব্ধির বা অনুভূতির রঙে সাহস, প্রেরণা, সান্ত্বনাকে প্রকাশ করে স্পর্শ করেছে সেই পরমসৌন্দর্যকে এবং হয়ে উঠেছে প্রকৃত কবিতা। লক্ষণীয় সেই কবিতাগুলোর সিংহভাগ অংশের মধ্যে ছড়িয়ে আছে অন্ধকার ও আলোর নানান প্রসঙ্গ। যা মূলত কবির সামাজিক নানা পর্যবেক্ষণ, একাকীত্ব, বিষণ্ণতা হতাশার প্রকাশ এবং তা থেকে উত্তরণের সাক্ষ্যকে বহন করেছে। কারণ আধুনিকতার যুগলক্ষণগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া কোন সচেতন কবির পক্ষেই সম্ভব নয়। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও পারেননি। এ প্রসঙ্গে তুলনামূলক ভাবেই তাঁর অগ্রজ কবিদের কথা প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে যারা যুগের ক্লান্তি, হতাশা নিরাশায় রক্তাক্ত হয়েছেন। যেমন - জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ। তবে ঐতিহ্যকে গ্রহণের পরেও স্বকীয়তাকে প্রকাশ করার পরীক্ষায় কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সফলতা পেয়েছেন একথা অনস্বীকার্য। এর পাশাপাশি কবির সমকালেও সাম্যবাদী ভাবধারায় উদ্ধুদ্ধ সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অরুণ মিত্রের লেখায় সাম্যবাদ, পুঁজিবাদী সভ্যতার আগ্রাসন, শ্রেণি সংগ্রামের যে ছবি আছে সেখান থেকেও কবি নিজেকে ব্যতিক্রমী রাখতে পেরেছিলেন। সেই কারণে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের ‘নীলনির্জনের’ মধ্যে রোমান্টিকতার প্রাধান্য দেখা যায়। পরবর্তী কবিতাতেও তিনি সাদামাটা অমলকান্তি বা সীতাংশুদের কথা বলেছেন। যারা রোদ্দুর ও শান্তিকে জীবনের পরম পাওয়া হিসেবে দেখেছিল। কিন্তু তবুও স্বাধীনতা উত্তর বঙ্গের সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের আগুন কবিকেও দগ্ধ করেছে কবির সংবেদনশীল মন আক্রান্ত হয়েছে অন্ধকারের দ্বারা আবার শিল্পী বলেই সেই আঁধারের মধ্যে করে গেছে আলোর অনুসন্ধান। আলো আঁধারের এই নানা তাৎপর্যগুলো এবারে আমরা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবো।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘নীলনির্জনে’ প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সালে। তবে এই এইকাব্যের কবিতাগুলো প্রকাশিত হয় স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বমুহূর্ত থেকে। কাজেই সেই সময়ে ভারতবর্ষ তথা বঙ্গের সামগ্রিক অস্থিরতা সহজেই বোঝা যায়। পরাধীনতার পদপেষণে পিষ্ট দেশবাসীদের বঙ্কনা, অপমান, ও শোষণ সমাজের বুকে অন্ধকারের বাতাবরণের সৃষ্টি করেছিল। সেখান থেকে মুক্তির জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ‘ভস্ম-অপমান - শয্যা’ ত্যাগ করে উজ্জীবিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন গোটা এশিয়াবাসী জনগণের কাছে। পরাধীনতার ‘অন্ধকার’ কাটিয়ে স্বাধীনতার ‘আলো’ আগতপ্রায়। ‘এশিয়া’ কবিতায় কবি বলেছেন, -

“দুর্বিনীত দুরন্ত আদেশ শুনে কারও

দীর্ঘ রাত্রি মরে যায়, ধসে পড়ে জীর্ণ রাজ্যপাট;

নির্ভর জনতা হাঁটে আলোর বলিষ্ঠ অভিসারে।

হে এশিয়া, রাত্রি শেষ, ‘ভস্ম – অপমান – শয্যা’ ছাড়ো,

উজ্জীবিত হও রুঢ় অসঙ্কোচ রৌদ্রের প্রহারে।”^২

এই জাগরণ শহর, বন্দর, গঞ্জে গ্রামে খেতে, খামারে সর্বব্যাপী। দূরন্ত এই আশ্বাসের আস্থানে অগন্য মানব শিশুকেই তিনি দৃঢ় পায়ে হেটে যেতে দেখেন। বীতনিদ্র এই জনশ্রোত বিদ্যুৎ উল্লাসে সমগ্র ভারত, সিংহলে ছড়িয়ে যেতে দেখছেন। সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমী সভ্যতার বর্বরোচিত আগ্রাসণের বিরুদ্ধে প্রাচ্যের দেশগুলোর প্রতিরোধের ভাষাটিকে বোঝাতেই কবি কবিতার নাম ‘এশিয়া’ দিয়েছেন। বিস্ময় এই সময়ের প্রেক্ষিতে ব্যক্তি মানুষও যে আক্রান্ত হবে তা বলাই বাহুল্য। এই ক্রান্তিকাল ব্যক্তিজীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা কামনাকে হত্যা করে জীবনে ভয় ও মৃত্যুর ভীতি জাগিয়ে তোলে ভীত মনের সমস্ত কপাট বন্ধ করে কবির জীবনকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তোলে। তাই দুর্ধর্ষ তুর্কি সেনাপতি ও তৈমুরীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা পশ্চিম এশিয়া ও মধ্য এশিয়াতে বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে ছিল শব, ভগ্নপ্রাসাদ, ও মুমূর্ষু মানুষের আত্মনাদের ভয়াবহ বাতাবহ গড়ে তুলেছিল তেমনই আশঙ্কায় বিদ্ধ হয়েছে কবিমন। ‘তৈমুর’ কবিতায়কবি বলেছেন -

“নগরে গ্রামে ও গঞ্জে মসজিদে মন্দিরে সর্বখানে

দূরন্ত তাতার - দস্যু তৈমুরের পদচিহ্ন আঁকা।

তৈমুর এখানে আসে দস্যুর মতন, জীবনের

কামনাকে হত্যা করে, একটানা অদ্ভুত আস্থানে

মৃত্যুকে যে ডাকে, তাঁর লোভাতুর অতর্কিত টানে

ছিঁড়ে আসে প্রাণের মৃণাল, ত্রস্ত জীবনের সুর

দূরন্ত আঘাতে থেমে যায় - ভয় বিহ্বল মনের

সমস্ত কপাট বন্ধ, এসে পড়ে কখন তৈমুর।”^৩

কামনাহীন জীবনের সুর যখন মৃত্যু ভীতির আঘাতে থেমে যায় তা আসলে মৃত্যুরই অনুভূতি। সেই মৃত্যু কখন কবি আস্থান জানিয়েছেন সর্বনাশা অন্ধকার গাঢ় হয়ে গেলে। অর্থাৎ অন্ধকার এখানে মৃত্যুর সহযোগী হয়ে উঠেছে। ‘ধবংসের আগে’ কবিতাটি এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

“পাতালের সর্বনাশা অন্ধকার গাঢ় হয়ে এলে

দৃঢ় হাতে টেনে দাও যবনিকা। নির্মম অস্থির

পদক্ষেপে আনো ভয়, বিশ্বাস বেদনা ঢেলে দাও;

ঢালো গ্লানি, ঢালো মৃত্যু, শিল্পীর বেহালা ভেঙে ফেলে

অন্ধকার রঙ্গমঞ্চে অটুহাসি দু’হাতে ছড়াও।”^৪

অন্ধকারে মৃত্যুকে ডাকছেন কিন্তু সেই মৃত্যুর কাছে কবি কি পরাজিত হচ্ছেন? উত্তর না। কারণ তিনি কবি ও শিল্পী। তিনি জানেন সেই মন্ত্র যার দ্বারা হাহাকার মিলিয়ে যায়, ছিন্নভিন্ন হাড়ে মজ্জামাংস জুড়ে যায় মৃত গাছে গজিয়ে ওঠে লাল ফুল। কবি বলেছেন, - “যে জানে প্রাণের মন্ত্র, কতটুকু মৃত্যু তাঁর কাছে।”^৫ মৃত্যুকে অন্ধকারকে জয় করে নিতে চেয়ে কবির ‘শেষ প্রার্থনা’ -

“অন্ধকারে দু-চোখ ভরে দিয়ো

আর কিছু নয়, আলোর ভালবাসা।”^৬

অন্ধকারের সঙ্গে মৃত্যুর এই সাযুজ্যের কথা আছে ‘শিয়রে মৃত্যুর হাত’ কবিতার মধ্যে। যেখানে বিবর্ণ আলো, অবসাদ, ন্যাসপাতির গন্ধ, চিন্তা ও ভীতির পরিবেশে এক মৃত্যুশয্যা শয়িত ব্যক্তির কথাকে তুলে ধরেছে। যার শিয়রেই আছে মৃত্যুর হাত। রাত্রির অন্ধকার সেই মৃত্যু সম্ভবনাকে করে তুলেছে আরও বেদনাবহ ও ভয়ানক -

“শিয়রে মৃত্যুর হাত। স্তব্ধীভূত সমস্ত কথার

মহুর আবেগে জমে অস্বস্তির হাওয়া। সারা ঘরে

অপেক্ষার নিঃশব্দ জটলা। যেন রাত্রির জঠরে
মানুষের সব ইচ্ছা - অনিচ্ছা ভাসিয়ে শূন্য সাদা
থমথমে ভয়ের বন্যা ফুলে ওঠে।”^৭

নিশ্বাসের স্তব্ধ হয়ে যাওয়া মৃত্যুরই ইঙ্গিত দিয়েছে। কিন্তু সেই মৃত্যু হয়ে উঠেছে প্রশান্তিপূর্ণ। তবে নীরেদ্রনাথ চক্রবর্তীর এই মৃত্যু ভাবনায় রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু ভাবনার মুক্তির ধারণা লক্ষ্য করা যায় না। সমসাময়িক নানা ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় কবি চিত্তে অন্ধকারের ভাবনাকে জাগিয়ে দিলেও কবি আঁধারেই নিমজ্জিত থাকেননি। আঁধার আলোর লড়াইয়ে তিনি স্বপ্ন দেখছেন এক পরম শিল্পীর যিনি আলোর প্রদীপকে জ্বালিয়ে তুলতে অশান্ত হয়ে ওঠেন। যে রাতে জ্যোৎস্না স্নিগ্ধতা ঝরে পড়ে, অর্থহীন কথা গানের মূর্ছনা পায়, সেই রাতে অন্ধকার কে পরাজিত করে আলোকবর্তিকার জ্বালে।

“সে এক পরম শিল্পী। সংশয় - দ্বিধার অন্ধকারে
সে ই বারে- বারে
আলোকবর্তিকা জ্বালে, দুঃখ তার পায়ে মাথা কোটে
তারই তো চুম্বনে ফুল ফোটে,
সে-ই তো প্রাণের বন্যা ঢালে
তুঙ্গভদ্রা, গঙ্গায় কি ভাকরা - নাঙালে।”^৮

আলোকসন্ধানী এই মানুষটি আসলে যে কবিরই আরেক সত্তা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখানেই কবিদের বিশেষত্ব। আলো আঁধারের দ্বন্দ্বিক লড়াইয়ে আলোর জয়ই সুনিশ্চিত হয়। নীলনির্জন কাব্যে শেষপর্বে রৌদ্র বা আলোর ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। যে আলোতে সবুজপাতার ফাঁকে ফাঁকে টগর জুঁই সূর্যমুখী ফুলেরা অপেক্ষায় থাকে সেই রৌদ্রের বাগানে কবি বিবর্ণ শরীর ও মন নিয়ে সকলকে দাঁড়াবার আহ্বান করেছেন।

“এসো এই মাঠের উপরে
খানিক সময় বসে থাকি,
এসো এই রৌদ্রের আঙনে
বিবর্ণ হলুদ হাত রাখি।
এই ধুধু আকাশের ঘরে
এমন নীরব ছলোছলো
করণাশীতল হাসি শুনে
ঘরে কে ফিরতে চায় বলো।”^৯

রৌদ্রের দীপ্তিময়তা অন্ধকারের গ্লানিকে যে একেবারে বিলুপ্ত করে দিয়েছে এমনটা নয়। কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘অন্ধকার বারান্দা’ তেও অন্ধকারের বোধ উপস্থিত থেকেছে। তবে তার মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে একাকীত্ব, বিষণ্ণতা, হতাশার ভাবনা। এই কাব্যের অন্যতম কবিতা ‘দেয়াল’ কবিতাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। যে আলোর বলমলানি কবির মনে আনন্দ জাগিয়ে তুলেছিল সেও আলোর বিন্দু গেলো আচমকা হারিয়ে গেলো। আলোহীন এই অন্ধকারে একাকীত্বের যন্ত্রণায় কবি আতঁরবে নিকষ কালোর অবয়বকে আঘাত করেও আলোর দেখা পাচ্ছেন না খুঁজে পাচ্ছেন না তার প্রিয়তমাকে।

“চেনা আলোর বিন্দুগুলো
হারিয়ে গেলো হঠাৎ -
এখন আমি অন্ধকারে, একা।
চারিদিকে চার- দেয়াল, চোখের দৃষ্টি নিবে আসে,
শিউরে উঠি অন্ধকারের কঠিন পরিহাসে;
এই নিরঙ্ক অন্ধকারে যতই হানি আঘাত,
আসবে না আর, আসবে না কেউ,

মিলবে না তার দেখা।”^{১০}

লক্ষণীয় কবি আলো হারিয়ে অন্ধকারের মধ্যে একাকীত্বের মধ্যে অবস্থান করছেন। আধুনিকতার ক্লান্তি, অবসাদ, বিষণ্ণতা এসবই এই পর্বে অন্ধকারের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়েছে। সেই সঙ্গে এটাও লক্ষণীয় অন্ধকারের পটভূমিকায় বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে নদীর চিত্রকল্প। অন্ধকারাচ্ছন্ন নদী প্রবাহের মধ্যেই কখনো কবি খুঁজে পেয়েছেন প্রিয়তমার অশ্রুজল, অন্ধকার নদীবক্ষে কবি নিজের বাড়িকে দেখেছেন, কখনো অন্ধকারের মধ্যে জেগে ওঠা অদৃশ্য নদীর দুঃখবোধের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে কবির বিষণ্ণতাবোধ। ‘মৃত্যুর পরে’ কবিতায় আদি অন্ধকারে নদীর স্থির শান্ত জলে প্রিয়তমার দৃষ্টিরহস্যকে বুঝতে চেয়েছেন। নদীর প্রবাহধারার শব্দে শুনতে ছেয়েছেন তার কণ্ঠস্বরকে। অন্ধকারাচ্ছন্ন নদী তাঁর প্রিয়তমার কষ্টকাতর অশ্রুজলের ব্যঞ্জনা দিয়েছে।

“দুদগু দাঁড়াই ঘাটে। তরঙ্গের অক্ষুট কল্লোলে
কান পাতি। যদি তাঁর কণ্ঠের আভাস পাওয়া যায়।
যদি এই মধ্যরাত্রে শীত - শীত সুন্দর হাওয়ায়
নদীর গভীরে তার কান্না জেগে ওঠে। হাত রাখি
জলের শরীরে। বলি, ‘নদী, তোর নয়নের কোলে
এতো অন্ধকার কেন, তুই তাঁর অশ্রুজল নাকি?’”^{১১}

তবে এ কাব্যেও অন্ধকারকে পরাজিত করে রৌদ্র যে পৃথিবীকে অনন্ত আনন্দের আশ্বাদ দিয়েছে তার দৃষ্টান্তও আছে প্রিয়তমাসু কবিতার মধ্যে।

“পৃথিবী রৌদ্রকে ধরে প্রসন্ন করপুটে।
দ্যাখো, কোনোখানে কোনো বিচ্ছেদ নেই;
আছে অনন্ত মিলনে অমেয় আনন্দ, প্রিয়তমা।”^{১২}

কখনো মনে হয়েছে এই অন্ধকারেই কবি বিচরণে স্বচ্ছন্দবোধ করছেন। যদিও আলোর পিপাসাও পরবর্তীতে জাগরুক থেকেছে। কিন্তু আলো আঁধারের রহস্যময়তার মধ্যে কখনো কবি তাঁর কল্পনাকে মেলে দিয়েছেন। কবির একান্ত নিজস্ব বাড়িটিকে নিজের করে অনুভব করতে গিয়ে ভেবেছেন যে, শান্ত উঠোন, মস্ত খামার, সবই তার নিজের। সেই বাড়ির আলমারিতে সাজানো বই, ফুলদানি, সুবিন্যস্ত সকল উপাদানই কবির নিজের। হঠাৎ কোথাও চলে গিয়ে ফিরে এসে নদীর তীরেই অন্ধকারেই তাঁর বাড়িটিকে দেখতে চেয়েছেন। ঠিক এই জায়গায় মনে হয় কবি বোধ হয় অন্ধকারের মধ্যে প্রবাহমান নদীর মধ্যে নিজের বাড়িটিকে দেখতে বেশ শান্তি অনুভব করছেন। সেই সঙ্গে এটাও বুঝিয়েছেন তাঁর বাড়ি বা আশ্রয় অন্ধকারে নদীর বক্ষে।

“ভাবতে ভাল লেগেছিল, কাউকে কিছু না জানিয়ে
হঠাৎ কোথাও চলে যাব।
ফিরে এসে আবার যেন দেখতে পারি,
যে-নদী বয় অন্ধকারে, তারই বুকের কাছে
বাড়িটা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।
ওই যে বাড়ি, ওই তো আমার বাড়ি।”^{১৩}

কবির দুঃখবোধ, ক্রন্দন, দীর্ঘশ্বাস এই পর্বে এসে নদীর সঙ্গেই মিশে গেছে। জলের কল্লোলে তিনি শুনতে পাচ্ছেন কারও কান্না, অরণ্যের মর্মরে শুনতে পারছেন কারও দীর্ঘশ্বাস। ফলে কবিতার মানুষটি প্রকৃতির কাছে নিজের দুঃখ জানাতে এসে দেখলেন প্রকৃতিই বেদনাক্রান্ত, বিষণ্ণ। কবি চিত্তের বেদনাবোধ মিশে গেছে প্রকৃতিরই সঙ্গে।

“জলের কল্লোলে যে কারও কান্না ধ্বনিত হতে পারে,
অরণ্যের মর্মরে কারও নিশ্বাস,
সে তা বঝেনি।

এবং ভাবেনি যে, নদীর ধারের সেই বাবলা গাছটাকে আজ
বিষম্ব একটা মানুষের মতো দেখাবে।”^{১৪}

কবিমনের এই বিষম্বতা নদীর মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে আরও উদাস ভঙ্গিমায় সন্ধ্যার আলো - আধারি বাতাবরণে।
পড়ন্ত বিকেলে মাঠের মধ্যে নদীটিকে দেখতে চেয়েছেন, যখন আকাশে বিষম্বতা ছড়িয়ে যাচ্ছে, তখন উড়ন্ত ক্লান্ত পাখিটিকে
কবি অন্ধকারে দেখতে চেয়েছেন, -

“ও তারা, ও রহস্যময়ী তারা,
একটু আলো জ্বালিয়ে ধর, দেখি রাখি
আকাশী কোন বিষম্বতা ছড়িয়ে যায় দিকে - দিকে,
দেখে রাখি অন্ধকারে উড়ন্ত ওই ক্লান্ত পাখিটিকে।”^{১৫}

অন্ধকারের ক্লান্তপাখি আসলে কবিরই অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তর্লোককে প্রকাশ করেছে। নীরেন্দ্রনাথের এই চিত্রকল্পে রবীন্দ্রনাথের
‘দুঃসময়’ কবিতার বিহঙ্গের প্রভাব বিদ্যমান। যেখানে কবি সংশয়াপন্ন, বিষাদগ্রস্ত তিমিরে মুক্তির শান্তির, আশ্রয়ের অনুসন্ধান
করেছেন। ক্লান্ত পাখিকে বলেছেন আরও এগিয়ে যাবার জন্য, উড়তে থাকার জন্য। বলেছেন -

তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোড়,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ, কোরো না পাখা।”^{১৬}

রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়সন্ধানী, মুক্তি সন্ধানী মননের আশ্রয় হয়েছে এই বিহঙ্গ। আলোচ্য কবিরও দুঃখের বেদনা সিক্ত হয়েছে
অন্ধকারের নদীও।

“এ কোন হাওয়া লেগে
অন্ধকারের অদৃশ্য ওই নদীর দুঃখ উঠলো জেগে।
ও হাওয়া, ও রহস্যময় হাওয়া!”^{১৭}

অন্ধকারে নদীকে দেখার কামনায় কবি শহরে যাওয়ার ইচ্ছেকেও বর্জন করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে শহরের চিৎকার,
ভিড়ের চেয়ে বন্ধু অমিতাভ, সিঁতাংশুরদের সঙ্গে অন্ধকারে নদীকে দেখবেন।

“শহরে ফিরব না কেউ আর।
বরং চুপ করে দেখি, অন্ধকারে নদী কত কালো
হতে পারে, অপচয়ী সূর্য তার সবটুকু সোনা
কী করে ওড়ায়; দেখি মৃদুকণ্ঠ তরঙ্গমালায়
নৌকার লণ্ঠন থেকে আলো পড়ে, আলো কাঁপে, আলো
ভেঙে - ভেঙে যায়।”^{১৮}

লক্ষণীয় এই কবিতার শেষ তিনটি লাইনে নৌকার আলো নদীর জলে প্রতিফলিত হওয়ার চিত্রকল্পকে অঙ্কন করেছেন।
কিন্তু নদীর স্রোতে প্রতিফলিত আলোর ‘ভেঙে’ যাওয়া যে চিত্রকল্পটি দুবার এ কবিতায় ব্যবহার করেছেন কবি যার দ্বারা
আলোর সংকট ও অন্ধকারের বিদ্যমানতাকে প্রকাশ করেছেন আসলে।

সমসাময়িক কবিদের থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় এপর্বে অতিসাধারণ কিছু মানুষের
জীবন কথাকে কবি তুলে ধরেছেন। যেমন - অমলকান্তি, সীতাংশু প্রমুখ চরিত্ররা। অতিসাধারণ জীবন লক্ষ্য রেখেও যারা
সফলতা ও শান্তির খোঁজ পায়নি। এ প্রসঙ্গে স্বনামধন্যা সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী বলেছেন, -

“তাঁর কবিতায় ষাটের দশকের মাঝামাঝি দেখা যায় একজন সাধারণ মানুষের প্রাধান্য। যে ‘অল্প একটু
সুখের কাঙাল’। অমলকান্তি নামে এক বালক তাঁর কবিতায় ডাক্তার, উকিল, হতে চায়নি - অমলকান্তি
রোদ্দুর হতে চেয়েছিল’ ... যা সে হতে পারেনি।”^{১৯}

কারণ -

“কবি ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকেই আমাদের দেখিয়ে দিতে শুরু করেন - সমাজের অবয়ব কিভাবে হয়ে উঠছে সুস্থ স্বাভাবিকতার প্রতিকূল।”^{২০}

স্কুলের সহপাঠী আনমনা গোছের অমলকান্তি ক্লাসের বাইরে জানলার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতো। ডাক্তার, উকিল, মাস্টার না হয়ে রোদ্দুর হতে চাওয়া নিশ্চয় ব্যতিক্রম। নীরেন্দ্রনাথের এই রোদ্দুর আসলে প্রানোহবলতার, সুস্থতার, মঙ্গলের, অকৃত্রিমতার প্রতীক। রোদ্দুরকেই কবি সর্বদা কামনা করেছেন অন্ধকারকে বিতাড়িত করতে। কিন্তু এই রোদ্দুর অমলকান্তি হতে পারেনি। কারণ স্বাধীনতা উত্তর সামাজিক রাজনৈতিক বিপর্যয়ে স্থলিত হয়েছে মানুষের মূল্যবোধ। মানব সমাজকে গ্রাস করেছে বিষণ্ণতা, একাকীত্বের অন্ধকার।

“অমলকান্তি রোদ্দুর হতে পারেনি।

সেই অমলকান্তি - রোদ্দুরের কথা ভাবতে - ভাবতে

ভাবতে - ভাবতে

যে একদিন রোদ্দুর হয়ে যেতে চেয়েছিল।”^{২১}

শান্তিহীনতার এই আঁধারে আক্রান্ত হয়েছে ‘দৃশ্যের বাহিরে’ কবিতার সীতাংশুও। যার জানালাহীন স্যাঁতস্যাঁতে ছোট ঘরে কোনভাবেই সুস্থভাবে থাকা যায় না। সেখানে নেই দৃশ্যমান কোন ঈশ্বরের ছবি নেই কোন শান্তি আছে শুধু অন্ধকার।

“তোর

ঘরের ভিতরে বড় অন্ধকার, বড়

বেশি অন্ধকার তোর ঘরের ভিতরে।”^{২২}

বিভ্রান্তিকর সময়ের পটভূমিকায় কোন বিকল্প পথের নিদান কবি দিতে পারেননি। শুধু সেই সময়ের অপ্রতিরোধ্য বিষক্রিয়ার প্রতিফলকে নিজ চিত্তে অনুভব করেছেন। আর ভালোলাগার নদীও তাকে কোন আলোর ইঙ্গিত দিতে পারেনি।

“পিতামহ, আমি এক নিষ্ঠুর নদীর ঠিক পাশে

দাঁড়িয়ে রয়েছি। পিতামহ,

দাঁড়িয়ে রয়েছি, আর চেয়ে দেখছি, রাত্রির আকাশে

ওঠেনি একটিও তারা।”^{২৩}

এমনি এক ‘আশ্চর্য’ সময়ে নদীতে জল নিয়ে বা পাহাড়ে মেঘ নিয়ে সংশয় জাগে। মনে হয় মানুষের শুভ ইচ্ছে, স্বপ্ন, ভবিষ্যতের উপর হাত রেখেছে ‘মৌলিক নিষাদ’ তাই চতুর্দিকেই কবি অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেখেন।

“আমি ভিতরে বাহিরে

যেদিকে তাকাই, আমি স্বদেশে বিদেশে

যেখানে তাকাই - শুধু অন্ধকার, শুধু অন্ধকার।

অন্ধকারে জেগে আছে মৌলিক নিষাদ - এই ভয়।”^{২৪}

এর পরবর্তী কাব্য ‘নিরন্তর করবী’। কাব্যের নামকরণেই আছে এক ধরনের বিবর্ণতার ব্যঞ্জনা। আঁধারের সর্বগ্রাসী আগ্রাসনে সবকিছুকেই যেন বিবর্ণ করে তুলেছে। যা সকল প্রাণের উৎস সেই সূর্যও সেই এই আঁধারের দ্বারা আক্রান্ত। এ কবির চূড়ান্ত বিষণ্ণতার ভাবকে প্রকাশ করেছে। তাই এখন সূর্যকে আর তাঁর বীরত্বপূর্ণ শিকারি বলে মনে মনে হচ্ছে না।

“আমরা দেখি না, কিন্তু অসংখ্য মানুষ একদিন

পূর্বাকাশে সেই শুদ্ধ উদ্ভাস দেখেছে,

যাকে দেখে মনে হত, নিহত সিংহের পিঠে গর্বিত পা রেখে

স্বর্গের শিকারি দাঁড়িয়েছে।”^{২৫}

যে রোদ্দুরের আলোর সিঞ্চে কবি নিজেকে প্রাণবন্ত, অন্ধকার মুক্ত করে তুলতে চেয়েছিলেন, অদ্ভুত ভাবে লক্ষ্য করলেন সেই রোদ্দুরই আঁধার আক্রান্ত।

“এখন রোদ্দুর দেখে মনে হয়, রোদ্দুরের পেটে

অনেক আঁধার রয়ে গেল।”^{২৬}

এই আঁধারে আক্রান্ত রোদ্দুরে রক্তকরবী ফুটেছে নিশ্চয়। তবে সেই রোদ্দুরে কবি যাবেন না। কারণ রোদ্দুর তাঁর কাছে মঙ্গলময় ঈশ্বরের সমতুল্য।

“রৌদ্র যে মুখোশ নয়, ঈশ্বরের মুখ,

আগে তা সুস্থির জেনে নেব।

না - জেনেই এখনই আমি বাহিরে-দুয়ারে দাঁড়াব না।”^{২৭}

এ সময়ে সামাজিক নান পরিবর্তনের আঘাতে বদলে গেছে মানুষের মনুষ্যত্ববোধ হয়ে উঠেছে স্বার্থপর, লোভী, চাটুকার। হারিয়ে ফেলেছে তাঁর মঙ্গল অমঙ্গলের ফারাক। সেই কারণে জন্তুর মতো রাত্রির অন্ধকারকেও পূজা করতে চাইছে। আর তার পায়ে উৎসর্গ করে দিচ্ছে ফুলের মতো পবিত্র মানবিকতাবোধ কেও।

“তারা বলল, “রাত্রি তো জন্তুই।

আমরা এখন উলঙ্গ হয়ে

ওই জন্তুর পূজায় বসব।

তুমি ফুল আনতে যাও।

আমি ফুল আনতে যাচ্ছিলাম।

পিছন থেকে তারা আমাকে ডাকল।

বলল, “ফুলগুলিকে ঘাড় মুচড়ে নিয়ে আসবে।”^{২৮}

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘অপেক্ষা’ কবিতায় বলেছেন -

“অন্ধকার নিকট করে, আলোতে করে দূর।”^{২৯}

সত্যিই আলোহীন অন্ধকার যাবতীয় দৃশ্যমান জগতের বহুবিচিত্র রূপকে এক করে তোলে। আর তখনই সবকিছুর মধ্যে দূরত্ব কমে যায়, অবসর হয় নিজেকে দেখার, নিজেকে বিশ্লেষণ করার। আলো-আঁধারের কবি নীরেন্দ্রনাথও যেন সেই আঁধারে নিজের মুখকে দেখতে চেয়েছেন ‘দিবারাত্রি কবিতা লেখা ‘নিয়ন-মণ্ডলে, অন্ধকার’ কবিতার পৌঢ় পালোয়ানের মতো। যিনি অন্ধকারের মধ্যে কবিতা প্রসব করলেন নিম্নরূপ -

“অন্ধকারে কোথায় অশ্রুর

ধারা বহে যায়।

কে যেন নিজের মুখ চিরকাল দেখতে চেয়েছে

নিয়ন-, মণ্ডলে, অন্ধকারে!”^{৩০}

অন্ধকারে নিজেকে যেমন চিনে নিতে চান কবি তেমনই এই অন্ধকারেই আলোর পরিভাষা তাকে শোনানোও সম্ভব বলে বিশ্বাস করেন কবি। কারণ অন্ধকারের জঠর থেকেই উদ্ভূত হয় সূর্যের সূচনা ঘটে এক সম্ভাবনাময় দিনের। ‘নক্ষত্র জয়ের জন্য, কাব্যগ্রন্থের ‘কেন যাওয়া কেন আসা’ কবিতায় কবি পাখির সঙ্গে তুলনা করেছেন নিজেকে। যে পাখিটি বরংবার ফিরে আসে খাঁচার কাছে। অন্ধকারে শোনাতে চায় আলোর পরিভাষাকে।

“কেন যাওয়া, গিয়েও কেন ফিরে আসা,

নিষেধ কেন চার দুয়ারে।

এবং কেন ফোটাও আলোর পরিভাষা

খাঁচার মধ্যে অন্ধকারে।”^{৩১}

চালাক এই পাখিটির মতো কবিও জীবনমঞ্চে বিচরণের পর ফিরে আসেন নিজের বক্ষমাঝের অন্ধকারে। যেখান থেকে আলোর দ্বীপ জ্বালানো সম্ভব। কারণ তিনি তো শিল্পী। সমসাময়িক নানা ঘটনার অভিঘাতে চিত্তলোকে আঁধার ছড়িয়ে গেলেও তাঁকে পরাজিত করার মন্ত্র তিনি জানেন। আর সেকারণে কবি নতুন উদ্যমে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হয়ে আলোর পাখির দিকে। মনে রাখতে হবে এই পাখি কোন ক্লান্ত পাখি নয় এই পাখি অন্ধকারেও আলোর পরিভাষা শোনাতে পারে। এ

প্রসঙ্গে ‘নিজের কাছে প্রতিশ্রুতি’ কবিতাটি উল্লেখনীয়। কবির অন্তরলোকে আলো-আঁধারের সুদীর্ঘ দ্বন্দ্ব কবি কখনো ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। হারিয়ে ফেলেছেন উদ্যম শক্তি। কিন্তু তিনি কখনোই আঁধারের কাছে পরাজিত হতে চান না। তাই ক্লান্তি মুছে নিজেই উঠে দাঁড়াতে চেয়েছেন, -

“আমি তোমার দুই জানুতে নতুন শক্তি ঢেলে দিলাম,
আবার তুমি উঠে দাঁড়াও।”^{৩২}

সময়ের বিষক্রিয়া থেকে নিজেকে মুক্ত করে আলোর দিকে হাত বাড়াতে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এবং নদীর সড়ে যাওয়া, শুকনো তরুলতা, পায়ের তলের আলগা মাটির বসে যাওয়া বা সমাজ সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও সামগ্রিক ক্ষয়িষ্ণু পরিবর্তনের দৃশ্য দেখেও বিশ্বাস রেখেছেন -

“আজ না হোক তো কাল, না হোক তো পরশু আবার
ফুটে উঠবে আলোর পাখি।”^{৩৩}

অপরাজয়ী মানসিকতায় কবি আঁধারের নিরাশাকে পরিত্যাগ করার জন্য নিজেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে তুলেছেন সেই আলোর পাখিকে দু-হাত বাড়িয়ে আনতে চেয়েছেন সমাজের বুকে নিজের বুক।

“পাখিটাকে ধরে আনবে, কথা ছিল।

এই কি তোমার কথা রাখা?

উঠে দাঁড়াও, রাখো তোমার প্রতিশ্রুতি।”^{৩৪}

প্রবন্ধের সূচনাতেই কবিতা কী আমরা এর উত্তর খুঁজতে কবিরই বক্তব্য উল্লেখ করে দেখিয়েছি যে, সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করানো কবিতার প্রধান লক্ষ্য হলেও কবিতা পাঠককে প্রেরণা, সাহস ও শিক্ষা প্রদান করে। আলো আঁধারের বহুমাত্রিক উপস্থিতিতে কবি আঁধারেই নিমজ্জিত থাকলেন না বরং ক্লান্ত মনের হতাশাকে কাটিয়ে তিনি আলোর দিকেই অনুগমন করলেন তা তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে দিয়ে দেখা যায়। যা নিঃসন্দেহে প্রেরণা ও সাহস, শিক্ষাকে প্রদান করে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য আমরা মূলত কবির নীলনির্জন থেকে নক্ষত্র জয়ের জন্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছি। আলো-আঁধারের পারস্পরিক অবস্থানের আরও বহুমুখী রূপ পরবর্তী কাব্যগুলোতেও বিদ্যমান। সূর্য থেকে উৎসারিত আলোক দেশে বিদেশের বিভিন্ন পুরাণ, লোকগাথা, ধর্মীয় বিশ্বাসে প্রাণেরই সৃষ্টি রহস্য হিসেবে মান্যতা পেয়েছে। শুধুমাত্র প্রাণের উৎস নয় ভারতীয় ঐতিহ্যের এই আলো বিবেচিত হয়েছে শুভ, শক্তি ও ঈশ্বরেরই প্রতীক রূপে। অন্যদিকে অন্যদিকে অন্ধকার ভারতীয় দর্শনে দুঃখ, বিষণ্ণতা, অশুভ শক্তির প্রতীক। সুপ্রাচীনকাল থেকেই নানা কবিদের লেখায় আলো সেই তাৎপর্যই ব্যবহৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানে ও উত্তর-রবীন্দ্রনাথ কবিদের লেখতেও এই আলো-আঁধারের ব্যবহার প্রচুর। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় এই আলো আঁধার অনুষঙ্গগুলোর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় স্বাধীনতা পূর্ব ও স্বাধীনতা উত্তরকালের সামাজিক নানা ঘটনার আলোড়নে পরাধীনতার গ্লানি, একাকীত্ব, হতাশা, বিবর্ণতা, অবসাদের অন্ধকারে ক্লান্ত হয়েছেন, তবে সেই অন্ধকারের আগ্রাসনে নিজেকে বন্দী না রেখে মুক্তি খুঁজেছেন আলোর মধ্যেই। এর কারণ কবির ভাষাতেই দেওয়া যায় -

“কেননা আমি তো শিল্পী।”^{৩৫}

অন্ধকারে নয় আলোতেই কবির মুক্তি, ভারতীয় ঐতিহ্যের মুক্তি। ব্রহ্মদারণ্যক উপনিষদেই সেই মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে -

“তমসো মা জ্যোতির্গময়।”^{৩৬}

Reference:

১. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, মে, ২০২১, কবিতার কী ও কেন, কোলকাতা - ৭০০০৭৩, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৩৬
২. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, নভেম্বর ২০২২, শ্রেষ্ঠ কবিতা, কোলকাতা - ৭০০০৭৩, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১৮
৩. তদেব, পৃ. ২০
৪. তদেব, পৃ. ২০

-
৫. তদেব, পৃ. ২০
 ৬. তদেব, পৃ. ২১
 ৭. তদেব, পৃ. ২৬
 ৮. তদেব, পৃ. ৩০
 ৯. তদেব, পৃ. ৩১
 ১০. তদেব, পৃ. ৩৪
 ১১. তদেব, পৃ. ৪১
 ১২. তদেব, পৃ. ৪৪
 ১৩. তদেব, পৃ. ৪৭
 ১৪. তদেব, পৃ. ৪৯
 ১৫. তদেব, পৃ. ৫০
 ১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, মাঘ ১৪১৫, সঞ্চয়িতা, কলকাতা - ৭৩, সাহিত্যম, পৃ. ২১৫
 ১৭. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, নভেম্বর ২০২২, শ্রেষ্ঠ কবিতা, কোলকাতা - ৭০০০৭৩, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৫০
 ১৮. তদেব, পৃ. ৫৬
 ১৯. চক্রবর্তী, সুমিতা, এপ্রিল ২০২৬, আধুনিক কবিতার চালচিত্র, কোলকাতা - ৭০০০০৬, সাহিত্যলোক, পৃ. ৮০
 ২০. তদেব, পৃ. ৮০
 ২১. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, নভেম্বর ২০২২, শ্রেষ্ঠ কবিতা, কোলকাতা - ৭০০০৭৩, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৫৩
 ২২. তদেব, পৃ. ৬০
 ২৩. তদেব, পৃ. ৬২
 ২৪. তদেব, পৃ. ৬৩
 ২৫. তদেব, পৃ. ৬৫
 ২৬. তদেব, পৃ. ৬৬
 ২৭. তদেব, পৃ. ৬৬
 ২৮. তদেব, পৃ. ৬৮
 ২৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, মাঘ ১৪১৫, সঞ্চয়িতা, কলকাতা - ৭৩, সাহিত্যম, পৃ. ৫৮
 ৩০. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, নভেম্বর ২০২২, শ্রেষ্ঠ কবিতা, কোলকাতা - ৭০০০৭৩, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৮৬
 ৩১. তদেব, পৃ. ১০৩
 ৩২. তদেব, পৃ. ১০৪
 ৩৩. তদেব, পৃ. ১০৫
 ৩৪. তদেব, পৃ. ১০৫
 ৩৫. তদেব, পৃ. ২০
 ৩৬. ব্রহ্মদারণ্যক উপনিষদ, ১.৩.২৮